بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদঃ আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত এ প্রবন্ধটি
ইসলামিক ল রিসার্স সেন্টার এন্ড লিগাল এইড বাংশাদেশের
ত্রৈয়মাসিক গবেষণা পত্রিকা ইসলামী আইন ও বিচার
২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ-২০০৬ এ প্রকাশিত

আমাদের সমাজের সকল মানুষ এবং ইসলাম সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তারা সকলেই জানেন যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষ সমাজের সকল মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম প্রেরণা। তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক ও ঐতিহাসিকভাবে তা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠির সকল মানুষই ধর্মীয়ভাবে শান্তিপ্রিয়। সবাই আমরা শান্তি চাই। এখন সমস্যা হলো, তাহলে ইসলামের নামে বোমাবাজি, অশান্তি, নিরিহ নিরপরাধ মানুষ হত্যা, আত্মহত্যা ইত্যাদি কেন ঘটছে? এ সকল ঘটনার কারণ জানা শুধু কৌতুহল নিবারণের বিষয় নয়, বরং সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়। সন্ত্রাস একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধি। এর নিরাময়ের জন্য এর সঠিক কারণ নির্ণয় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক কারণ নির্ণয় এই ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ের পথ সুগম করবে। পক্ষান্তরে এর কারণ নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সমস্যাকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলতে পারে।

ইসলামের নামে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সারা বিশ্বে অমুসলিম ও মুসলিম গবেষক-বুদ্ধিজীবীগণ জঙ্গিবাদের যে সকল কারণ উল্লেখ করছেন সেগুলির অন্যতম হলো: (১) ইসলাম, (২) ইসলামী শিক্ষা, (৩) ওহাবী মতবাদ ও (৪) পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র।

আলোচিত প্রথম কারণ: ইসলাম

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে দায়ী করেন। তাদের মতে ইসলাম তার অনুসারীদের অসহিষ্ণুতা ও জঙ্গিবাদ শিক্ষা দেয়। ইসলামে জিহাদের নামে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এর ফলেই মুসলিমদের মধ্যে জঙ্গিবাদের উত্থান। তাদের মতে ইসলামী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বন্ধ করার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মকে নির্মুল অথবা নিয়ন্ত্রণ করা। এরা দাবি করেন যে, ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত আবশ্যম্ভাবী। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদের উত্থান 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের সঠিকত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

এক্ষেত্রে মানব সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য এই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হলো, শক্তির মাধ্যমে এদেরকে হত্যা করা, বন্দি করা ও মুসলিম দেশগুলিকে সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষত, ইসলামী শিক্ষার বিস্তার রোধ করা। এ সকল গবেষক-পণ্ডিতদেরকে হয়ত মুসলিমগণ 'ইসলাম-বিদ্বেষী' বলে মনে করতে পারেন, তবে এদের অনেকের ক্ষেত্রেই এরূপ মতপ্রকাশের জন্য বিদ্বেষের চেয়ে অজ্ঞতাই বড় কারণ। এদের অনেকেই ইসলামের জিহাদ বিষয়ক কিছু নিদের্শ হয়ত পাঠ করেছেন, কিন্তু জিহাদের প্রকৃত অর্থ, শর্ত বা বিধানাবলি জানেন নি। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিম ধর্ম-প্রচারক বা ধর্মগুরুদের প্রচারণামূলক বইপুস্তকই পাঠ করেছেন, ইসলামী জ্ঞানের সূত্রগুলি থেকে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন নি। এরা দেখছেন যে, কোনো কোনো মুসলিম নির্বিচারে নিরপরাধ মানুষ হত্যা করছে এবং এজন্য তারা ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করছে কাজেই তাঁরা ধারণা করেন যে, কুরআন এইরূপই শিক্ষা দিয়ে থাকে। এভাবেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এই জঙ্গিবাদের জন্য ইসলামই দায়ী এবং ইসলামকে নির্মুল বা নিয়ন্ত্রণ করাই এই সমস্যা দূরীকরণের একমাত্র উপায়।

পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত, যারা বিভিন্ন মুসলিম সমাজ ও জনগোষ্ঠির সাথে সুপরিচিত বা ইসলাম ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা পরিচিত, তারা উপর্যুক্ত মতামত পুরোপরি সমর্থন করেন না। তারা মনে করেন, ইসলামে অনেক ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহঅবস্থান সম্ভব। তবে ইসলামের মধ্যে ভাল বিষয়ের সাথে জিহাদ, ধর্মত্যাগ, বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ক কিছু উগ্র ও অসহিষ্ণু বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেগুলি মানবাধিকার বা সভ্যতার সহঅবস্থান বা বিকাশের বিপক্ষে। এ সকল শিক্ষা থেকেই জঙ্গিবাদের জন্ম। এজন্য জঙ্গিবাদ দমনের জন্য ইসলামের 'ভাল শিক্ষাগুলির' প্রসংশা করতে হবে ও সেগুলির বিকাশ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি উগ্র বা 'খারাপ' শিক্ষার বিস্তার রোধ করতে হবে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। এ থেকে 'উগ্রতা' উৎসাহ দিতে পারে এরূপ শিক্ষা বাদ দিতে হবে। এভাবে মুসলিম সমাজগুলিতে 'মডারেট' মুসলিমদের উত্থান ঘটাতে পারলেই জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

আলোচিত দ্বিতীয় কারণ: ইসলামী শিক্ষা

বিশ্বের ধার্মিক বা অধার্মিক কোনো মুসলিমই উপর্যুক্ত মতামতদ্বয় সঠিক বলে মানতে পারেন না। বরং তারা একে বাস্তবতা বিবর্জিত এবং বিদ্বেষমূলক মত বলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা অনুভব করেন যে, যদি ইসলাম ধর্মই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী হতো তবে আমরা সকল মুসলিমই আমাদের মধ্যে জঙ্গিবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করতাম। মুসলিম পরিবারে বা সমাজে লালিত পালিত সকল ধার্মিক বা অধার্মিক মুসলিমই ইসলাম সম্পর্কে কমবেশি কিছু শিক্ষা পরিবার, প্রতিষ্ঠান বা সমাজ থেকে পেয়েছেন। কিন্তু কখনোই তারা অমুসলিম বা অন্যান্য মতাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণুতার শিক্ষা পান নি। সকল মুসলিম সমাজেই মুসলিমগণ অমুসলিমদের সাথে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছেন। কাজেই জঙ্গিবাদের জন্য ইসলাম কখনো দায়ী হতে পারে না। সমস্যা থাকলে অন্য কোথাও রয়েছে, ইসলামের মধ্যে

www.assunnahtrust.com

নয়। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মুসলিম সন্ত্রাসের সাথে জাড়িত। তবে তারা কখনোই স্বীকার করেন না যে, তাদের ধর্ম তাদের সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। বরং এ সকল সন্ত্রাসীদের ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি, মানসিক বিক্ষুব্ধতা, সামাজিক অনাচার বা অন্য কোনো কারণ এর পিছনে কার্যকর।

এদের অনেকেই মনে করেন যে, জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য মূলত দায়ী ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার। জঙ্গিবাদের বিস্তারে মাদ্রাসা শিক্ষার এই দায়িত্বের প্রকৃতি নির্ণয়ে এ সকল পণ্ডিতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অমুসলিম পাণ্ডিতগণও 'ইসলামী শিক্ষাকেই' মূলত জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য দায়ি করছেন। তবে 'দায়িত্বের' প্রকৃতি নির্ণয়ে তাদের মধ্যে এবং তাদের সাথে মুসলিম পণ্ডিতদের বিভিন্নতা রয়েছে। কেউ মনে করছেন যেহেতু ইসলামের মধ্যেই জঙ্গিবাদের শিক্ষা রয়েছে, সেহেতু ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার মানেই জঙ্গিবাদের প্রসার। যত বেশি কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ ইত্যাদি ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষা প্রসার লাভ করবে, ততই বেশি 'জিহাদী' মনোভাব, অন্য ধর্ম ও অন্য মতের প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব ও মোল্লাতান্ত্রিক (theocratic) স্বৈরাচারী সরকার জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাব প্রসার লাভ করবে। এজন্য ইসলামী শিক্ষা বা ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রসার রোধই জাঙ্গিবাদ দমনের প্রধান উপায়।

অন্য অনেকে মনে করেন যে, ইসলামের মধ্যে মূলত জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই, তবে ইসলামী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাগুলিতে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথবা এগুলির পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামকে জঙ্গিবাদী রূপদানের সহায়ক। অথবা ইসলামী আবেগের অপব্যবহার করে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদেরকে সহজেই জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা যায়। কেউ মনে করছেন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবেই ইসলামের শিক্ষা প্রদান করছে, তবে সম্ভবত শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়েছে, যে কারণে এগুলি জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছে। এদের মতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারই জঙ্গিবাদ রোধের উপায়। " It is a fact that some of the Madrasha students have got involved with what is called 'Islamic' militancy.... Though Madrasha education may not be held rresponsible for thes most unwanted activities, yet there are some loopholes and it is time to think about bringing Madrasha education into the mainstream."[১]

'ইসলামী জঙ্গিবাদের' জন্য 'ইসলাম'-কে দায়ী করলে যেমন মুসলিমগণ হতবাক, বিস্মিত, ব্যথিত বা উত্তেজিত হয়ে এইরূপ মতকে বিদ্বেষমূলক বলে মনে করেন, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসার সাথে জড়িত মানুষরাও এই দ্বিতীয় মতটির বিষয়ে একইরূপ বিস্ময়, ব্যথা বা উত্তেজনা অনুভব করেন।

তাঁরা অনুভব করেন যে, যদি ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষাই জঙ্গিবাদের জন্য দায়ী হতো তবে আমরা মাদ্রাসার সকল ছাত্র শিক্ষক আমাদের মধ্যে জঙ্গিবাদের আগ্রহ বা প্রেরণা অনুভব করতাম। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কখনোই তা নয়। সন্ত্রাস, হত্যা ও ধ্বংসের প্রতি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ও বিরোধিতা অনুভব করছেন এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা আলেম, ইমাম ও পীর-মাশাইখ। বিগত প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা উপমহাদেশে চালু রয়েছে এবং মূলত একই পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে চলেছে। এছাড়া অনুরূপ পদ্ধতির অগণিত মাদ্রাসা মালয়েশিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশে চালু রয়েছে। এগুলি থেকে বের হয়ে আসা অগণিত মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করেছেন, কিন্তু ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই তাঁরা সন্ত্রাসের জন্ম দেন নি। তাঁরা অস্বীকার করেন না যে, কিছু মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক এই অপরাধের সাথে জাড়িত; তবে তারা কখনোই বিশ্বাস করেন না যে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের এই অপরাধের জন্য দায়ী। বরং তা তাদের ব্যক্তিগত বিভ্রান্তি।

এ সকল মাদ্রাসাশিক্ষিত মানুষেরা উপর্যুক্ত পাণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদেরকে 'ইসলামীশিক্ষা বিদ্বেষী' বা 'মাদ্রাসা বিদ্বেষী' বলে মনে করে থাকেন। তবে আমার কাছে মনে হয় 'ইসলামী জঙ্গিবাদের' জন্য 'ইসলাম ধর্ম'-কে দায়ী করা এবং 'ইসলামী শিক্ষা'-কে দায়ী করা উভয় মতের পিছনেই মূলত অজ্ঞতা কার্যকর। পাশ্চাত্য অমুসলিম পণ্ডিতগণ যেমন কোনো কোনো মুসলিমকে সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত দেখে সন্ত্রাসীর ধর্মকে দায়ী করছেন, তেমনি অনেকে কোনো কোনো মাদ্রাসা শিক্ষিতকে সন্ত্রাসে লিপ্ত দেখে সন্ত্রাসীর শিক্ষাকে দায়ী করছেন। এ সকল পণ্ডিতের অনেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে পরিচিত নন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে তাঁরা জানতে পারেন যে, মাদ্রাসাগুলিতে জঙ্গিবাদীদের আখড়া এবং মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকগণ জঙ্গি কার্যক্রমে লিপ্ত। এথেকে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষাই মূলত জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তারের জন্য দায়ী।

সাধারণভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো অপরাধীর অপরাধের জন্য তার ধর্ম, শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার ইত্যাদি সাধারণত দায়ী হয় না। তদুপরি আমি এখানে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য পাঠককে অনুরোধ করছি।

(১) আমাদের সমাজের লক্ষ লক্ষ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক সকলেই আমাদের দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিভিন্ন সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। এদের দুর্নীতির জন্য কেউই তাদের শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করেন না। কারণ তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করেন তারাও একই শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত। তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বা এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনোই দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় না, বরং সততা ও আদর্শই শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজেই দুর্নীতিবাজের দুর্নীতির জন্য তার ব্যক্তিগত লোভ, সামাজিক অনাচার, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ইত্যাদিই দায়ী; তার ধর্ম, শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। এজন্য কোনো অজ্ঞ মানুষ বা 'মাদ্রাসা শিক্ষিত' মানুষ দুর্নীতির প্রসারের জন্য 'আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা' বা 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' দায়ী বলে মন্তব্য করলে বা ডাক্তারদের 'কসাইসুলভ আচরণের জন্য' মেডিকেল কলেজগুলি' দায়ী বলে মন্ত

[১] Letter of a reader, The daily Independent 14/1/2006.

www.assunnahtrust.com

ব্য করলে শিক্ষিত মানুষেরা তাকে মুর্খ বা নির্বোধ বলেই মনে করবেন।

(২) অনুরূপভাবে আমাদের দেশের অনেক মানুষই সমাজতন্ত্র বা 'সর্বহারার রাজত্বের' নামে সন্ত্রাসকর্মে লিপ্ত। এরা আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে শিক্ষা লাভ করেছেন। কিন্তু কেউই বলবেন না যে, এদের ঘৃণ্য কর্মের জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দায়ী।

(৩) স্বাধীনতা, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমানে আমেরিকার প্রশাসন ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান জীবন ও সম্পদ হারিয়েছেন। তারা নির্বিচার বোমা মেরে ফালুজা ও অন্যান্য শহরে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের 'গণহত্যাযজ্ঞে' লিপ্ত হয়েছেন এবং সম্পদ ধ্বংস করেছেন এবং এরপর কয়েকশত কুর্দীকে হত্যার অপরাধে তারা সাদ্দাম হোসেনের বিচার করছেন। ইরাকী, আরব, মুসলিম ও বিশ্বের যে কোনো দেশ ও ধর্মের শান্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মানবতার বিরুদ্ধে কঠিনতম অপরাধ। এখানে একজন বিক্ষুব্ধ ইরাকী, আরব বা মুসলমান এই অপরাধের জন্য 'খৃস্টধর্ম', 'গণতন্ত্র' বা 'আমেরিকান সভ্যতা'-কে দায়ী করে মন্তব্য করতে পারেন; কারণ প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার সহকর্মীবৃন্দ 'বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ খৃস্টান, আমেরিকান সভ্যতার সন্তান ও গণতন্ত্রের ধারক-বাহক'। কিন্তু কোনো খৃস্টান, আমেরিকান, গণতন্ত্র প্রেমিক বা কোনো একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত এই মতের সাথে একমত হবেন না। তারা একে অজ্ঞতা প্রসূত প্রলাপ বলেই মনে করবেন। কারণ তারা জানেন যে, খৃস্টধর্ম, গণতন্ত্র বা আমেরিকান সভ্যতা কোনোটির এইরূপ হত্যাযজ্ঞ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও লুটতরাজ শিক্ষা দেয় না বা সমর্থন করে না। মার্কিন প্রশাসন যা করছেন তা বর্তমান নেতৃবৃন্দের অন্যায়, এরজন্য তাদের ধর্ম, আদর্শ বা সভ্যতা দায়ী নয়।

(৪) ইসলামী শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়টিও একই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করা মানুষদের দুর্নীতি বা সন্ত্রাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৎ ও নীতিবান ছাত্রদের কাছে তা পাগলামি বলে মনে হয়, তেমনিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষিত কতিপয় মানুষের সন্ত্রাসের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করলেও মাদ্রসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত সাধারণ মানুষদের কাছে পাগলামি বলেই মনে হয়।

(৫) বর্তমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সম্পৃক্তির মূল বিষয়টিও বিবেচ্য। আমরা দেখেছি যে, সহিংসতা বা সন্ত্রাসে লিপ্ত ব্যক্তি নিজের ধর্ম বা আদর্শকে ব্যবহার করেন। দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে মানুষের গণতান্ত্রিক অনুভূতি ও মানবাধিকারের প্রতি ভালবাসাকে ব্যবহার (exploit) করা হয়। এভাবেই আমেরিকার গণতন্ত্রপ্রেমিক ও মানবাধিকারবাদী মানুষেরা প্রেসিডেন্ট বুশকে ম্যান্ডেট দিয়েছেন আত্মরক্ষা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইরাকের নিরীহ নিরপরাধ মানুষদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ চালানোর।

স্বভাবতই ইসলামের নামে সন্ত্রাসে ইসলামী অনুভুতিকে ব্যবহার (exploit) করা হয়েছে ও হচ্ছে। এতে কোনো কোনো ইসলামপ্রেমিক সরল মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন। মাদ্রাসায় পড়া কোনো মানুষ এরূপ প্রতারণার শিকার হতে পারেন না এরূপ দাবি কেউই করেন না। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসে যেমন গণতন্ত্র প্রেমিকরা প্রতারিত হচ্ছেন, তেমনি ইসলামের নামে সন্ত্রাসে ইসলাম প্রেমিক মাদ্রাসা ছাত্ররা বেশি প্রতারিত হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত। জঙ্গিরা হয়ত তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিজেরা কোনো 'মাদ্রাসা' বা 'মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলি বা মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা দলে দলে এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যোগদান করেছেন। 'ইসলামী সন্ত্রাস' নামক এই জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত মাদ্রাসা শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম।

সংবাদ মাধ্যমের সংবাদ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। এরূপ সংবাদ, গণমাধ্যমীয় গবেষণা-প্রবন্ধ ও পর্যালোচনার উপর নির্ভর করে আমেরিকার জনগণ নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল যে, সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র (weapon of mass destruction) রয়েছে, যা আমেরিকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি। আর এজন্যই তারা একবাক্যে প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন। আজ লক্ষ লক্ষ মানব সন্তানের রক্ত ঝরানো এবং অমূল্য মানবীয় সম্পদের ধ্বংসলীলার পরে সবাই জানতে পারলেন ও স্বীকার করলেন যে, এরূপ কোনো অস্ত্র কোনোকালেই সেখানে ছিল না।

সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এখনো সবাই জানলেন না যে, এইরূপ অস্ত্র থাকলেও কোনো দিনই ইরাক আমেরিকার স্বাধীনতা বা নিরাপত্তার হুমকি হতে পারত না। শুধু ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই গণহত্যা। সংবাদ মাধ্যমের কারণেই এশিয়ার সুনামি মহা সংবাদে পরিণত হয়, কিন্তু ফালুজার গণহত্যা ও মহাধ্বংস কোনো সংবাদই হয় না।

এজন্য গণমাধ্যমের সংবাদ বা তথ্যের উপর নির্ভর করা তো দূরের কথা, সুপ্রশিক্ষিত 'ইন্টেলিজেন্সী'র সুনিশ্চিত রিপোর্টের উপর নির্ভর করাও কঠিন। এ সকল তথ্যের বাইরে বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের দেশের আনাচে কানাচে অগণিত মাদ্রাসা ছড়িয়ে রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসার কর্মকাণ্ড সবকিছুই সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এগুলির ছাত্র শিক্ষক সকলেই সমাজের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। এদের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসীর অস্তিত্ব আমরা পাই না। মাদ্রাসা শিক্ষিত যে সকল মানুষ জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়েছেন বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি তাদের আনুপাতিক হার স্কুল-শিক্ষিত মানুষদের চেয়ে বেশি নয়। সর্বোপরি আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, এই সন্ত্রাসের উদ্ভব 'মাদ্রাসা-শিক্ষিত গুরুদের' দ্বারা নয়, বরং সাধারণ-শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিকতা থেকে ধার্মিকতায় রূপান্তরিত 'গুরু' ও 'মুফতি'দের দ্বারা। এখানে দুই চার জন মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষ প্রভাবক বা প্রতারক নয়, বরং প্রভাবিত ও প্রতারিত।

(৬) এখানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, সমস্যার কারণ নির্ধারণে বিভ্রান্তি অনেক সময় সমস্যা উস্কে দিতে পারে। সন্ত্রাসের জন্য সন্ত্রাসীর জাতি, ধর্ম, গোত্র, দল বা শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করলে মূলত সন্ত্রাসীকে সাহায্য করা হয়। এতে একদিকে সন্ত্রাসীর স্বজাতি, স্বধর্ম, স্বদল বা স্বশিক্ষার মানুষেরা সন্ত্রাসের বিরোধিতার পরিবর্তে সন্ত্রাস বিরোধীদের সাথে বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েন, অপরদিকে পরোক্ষভাবে তাদের মধ্যে সন্ত্রাসীর প্রতি এক প্রকারের 'সহমর্মিতা' জন্মলাভ করে। আমরা দেখেছি যে, কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে দায়ী বলে

www.assunnahtrust.com

মন্তব্য করে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতকেই উস্কে দিচ্ছেন। সন্ত্রাসের জন্য ইসলামী শিক্ষাকে দায়ী করলেও একইভাবে সন্ত্রাসকে উস্কে দেওয়া হবে এবং সন্ত্রাসীদের জন্য সহমর্মী সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষিত মানুষেরা সন্ত্রাস বিরোধিতার বদলে অপ্রাসঙ্গিক বির্তকে জাড়িয়ে পড়বেন।

সর্বোপরি এরূপ মতামতের ভিত্তিতে যদি সরকার বা প্রশাসন মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, সংকোচন বা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ঢালাও কোনো কর্মকাণ্ড হাতে নেন তবে তাতে নতুন এক প্রকারের সহিংসতায় আক্রান্ত হবে দেশ ও জাতি।

মূলত কোনো ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শ সহিংসতা বা সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় না। মানুষ মানবীয় লোভ, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদির কারণে সহিংসতা বা হিংস্রতায় লিপ্ত হয়। এরূপ সহিংসতায় লিপ্ত ব্যক্তি নিজের কর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য, নিজের বিবেককে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করার জন্য, অন্যকে নিজের পক্ষে টানার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে নিজের আদর্শকে ব্যবহার করে।

এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে বসবাসকারী আরবদেরকে পূর্ব জেরুযালেম ও অন্যান্য ফিলিস্তিনী এলাকা থেকে সন্ত্রাস, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে বিতাড়ন করে অন্যান্য দেশে হাজার বছর ধরে বসবাসকারী ইহূদীদেরকে সেখানে নিয়ে এসে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ইহূদী-খৃস্টানগণ পবিত্র বাইবেলের বাণীকে ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে আইরিশ ক্যাথলিক ব্রিটিশ প্রটেস্ট্যান্টের বিরুদ্ধে নিজের ধর্মমতকে ব্যবহার করেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধ চীনের বিরুদ্ধে নিজের বৌদ্ধ ধর্মমতকে ব্যবহার করেন, নিম্নবর্ণের হিন্দু উচ্চবর্ণের হিন্দুর বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বা ধর্মীয় মতামত ব্যবহার করেন, ফিলিস্তিনী যোদ্ধা ইহূদী দখলদারের বিরুদ্ধে নিজের ইসলাম বা খৃস্টান ধর্ম থেকে উদ্দীপনা বা প্রেরণা লাভের চেষ্টা করেন।

আমাদের সমাজে 'আওয়ামী লীগের' কর্মী যদি কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হন তখন তখন তিনি 'স্বাধীনতা', বঙ্গবন্ধু, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ইত্যাদি মহান ও মর্যাদাময় বিষয়কে তার কর্মের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে 'বিএনপি'র কর্মী বা সমর্থক এই ক্ষেত্রে 'শহীদ জিয়া', জাতীয়তা, স্বাধীনতা ইত্যাদি মহান বিষয়কে নিজের 'এক্সকিউজ' হিসেবে ব্যবহার করেন। উভয় ক্ষেত্রেই দলের অন্যান্য বিচক্ষণ কর্মী জানেন যে, নিজের সহিংসতা বৈধ করার জন্যই এগুলি বলা হচ্ছে।

সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করে মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা বা মাদ্রাসা শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিলে স্বভাবতই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সহিংসতায় লিপ্ত হবেন এবং 'ইসলাম' ও 'ইসলামী শিক্ষা'-র বিপন্নতাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করবেন। এতে একমাত্র সন্ত্রাসীরাই লাভবান হবে এবং জাতি ভয়ঙ্কর সংঘাতের মধ্যে নিপতিত হবে।

আলোচিত তৃতীয় কারণঃ ওহাবী মতবাদ

'ওহাবী মতবাদ'-কে জঙ্গিবাদের কারণ হিসেবে অনেক গবেষক উল্লেখ করছেন। বর্তমান সৌদি আরবের ধর্মীয় নেতা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩-১৭৯২ খৃ) প্রচারিত মতবাদকে 'ওহাবী' মতবাদ বলা হয়। তিনি তৎকালীন আরবে প্রচলিত কবর পুজা, কবরে সাজদা করা, কবরে বা গাছে সুতা বেঁধে রাখা, মানত করা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের কুসংস্কার, শিরক, বিদ'আত ইত্যাদির প্রতিবাদ করেন। তাঁর বক্তব্য শুধু প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু তাঁর বিরোধীদের তিনি মুশরিক বলে অভিহিত করতেন। ১৭৪৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের অনতিদূরে অবস্থিত দিরইয়্যা নামক ছোট্ট গ্রাম-রাজ্যের শাসক আমীর 'মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ (মৃত্যু ১৭৬৫) তাঁর সাথে যোগ দেন। তাদের অনুসারীগণ তাদের বিরোধীদেরকে মুশরিক বলে গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালন শুরু করেন। ১৮০৪ সালের মধ্যেই মক্কা-হিজায সহ আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ 'সাউদী'-'ওহাবী'দের অধীনে চলে আসে।

তৎকালীন তুর্কী খিলাফত এই নতুন রাজত্বকে তার আধিপত্য ও নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে করেন। কারণ একদিকে মক্কা-মদীনা সহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, অন্যদিকে মূল আরবে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান মুসলিম বিশ্বে তুর্কী খিলাফতের একচ্ছত্র নেতৃত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য তুর্কী খলীফা দরবারের আলিমগণের মাধ্যমে ওহাবীদেরকে ধর্মত্যাগী, ধর্মদ্রোহী, কাফির ও ইসলামের অন্যতম শত্রু হিসেবে ফাতওয়া প্রচার করেন। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারাভিযান চালানো হয়, যেন কেউ এই নব্য রাজত্বকে ইসলামী খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত মনে না করে। পাশাপাশি তিনি তুর্কী নিয়ন্ত্রণাধীন মিসরের শাসক মুহাম্মাদ আলীকে ওহাবীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। মিশরীয় তুর্কী বাহিনীর অভিযানের মুখে ১৮১৮ সালে সউদী রাজত্বের পতন ঘটে। এরপর সাউদী রাজবংশের উত্তর পুরুষেরা বারংবার নিজেদের রাজত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সর্বশেষ এই বংশের 'আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান আল-সাউদ (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯০১ থেকে ১৯২৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বর্তমান 'সৌদি আরব প্রতিষ্ঠা করেন।

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম বিশ্বের যেখানেই সংস্কারমূলক কোনো দাওয়াত প্রচারিত হয়েছে, তাকেই সৌদি ওহাবীগণ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাবের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত বা 'ওহাবী আন্দোলন' বলে দাবি করেছেন। অপরদিকে তুর্কী প্রচারণায় 'ওহাবী' শব্দটি মুসলিম সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হয়। তাদেরকে অন্যান্য সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের চেয়েও অধিকতর ঘৃণা করা হয়। ফলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বৃটিশ বিরোধী আলিমদেরকে ওহাবী বলে প্রচার করতেন; যেন সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা না থাকে। এছাড়া মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরকে নিন্দা করার জন্য 'ওহাবী' শব্দের ব্যাপক ব্যাবহার করেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের সমসাময়িক ভারতীয় মুসলিম সংস্কারক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২ খৃ)। তাঁর মত-প্রচারের প্রথম দিকে ১৭৩১ খৃস্টাব্দে তিনি মক্কায় গমন করেন এবং তিন বৎসর তথায় অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফিরে তিনি ভারতে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনিও কবর পূজা, পীর পূজা, কবরে মানত করা, কবরবাসী বা জীবিত পীর বা ওলীগণের কাছে বিপদমুক্তির সাহায্য চাওয়া ও অন্যান্য শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, মাযহাবী বাড়াবাড়ি ইত্যাদির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে 'ওহাবী' বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

তবে ভারতের সর্বপ্রথম সংবিধিবদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ 'ওহাবী' নেতা ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের (১৩৪৬-১৮২৩

www.assunnahtrust.com

খৃ) অন্যতম ছাত্র সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (১৭৮৬-১৮৩১ খৃ)। তিনি সমগ্র ভারতে মাযার, দরগা, ব্যক্তি পূজা, মৃত মানুষদের নামে মানত, শিন্নি ইত্যাদি বিভিন্ন শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। এছাড়া তিনি বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮২১ খৃস্টাব্দে তিনি হজ্জে গমন করেন। প্রায় তিন বৎসর তথায় অবস্থানের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে তিনি বৃটিশ ভারত থেকে 'হিজরত' করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করে সেখানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং নিজে সেই রাষ্ট্রের প্রধান হন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সেখানে একত্রিত হয়ে বৃটিশ ও শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কয়েকটি যুদ্ধের পরে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তী প্রায় ৩০ বৎসর সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অনুসারীগণ বৃটিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্ন জিহাদ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যান।

বৃটিশ সরকার সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেন। তারা দাবি করেন যে, হজ্জ উপলক্ষে আরবে গমন করে তথাকার ওহাবীদের থেকে দীক্ষা নিয়েই তিনি তার সংস্কার ও জিহাদ আন্দোলন শুরু করেন। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর শিষ্যদের থেকে ভারতে বিভিন্ন সংস্কারমুখী ধারার জন্ম নেয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে অনেকে নির্ধারিত মাযহাব অনুসরণ অস্বীকার করে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে দাবি করেন। এছাড়া তাঁর শিষ্য জৌনপূরের পীর মাওলানা কারামত আলী একটি সংস্কারমুখী ধারার জন্ম দেন। ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বাক্‌র সিদ্দীকীও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর মতানুসারী ও তাঁর প্র-শিষ্য ছিলেন। এছাড়া দেওবন্দের আলিমগণও তাঁরই শিষ্যদের থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। এদেরর সকলকেই প্রতিপক্ষগণ, ঔপনিবেশিক সরকার ও সৌদি ওহাবীগণ 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশেষত আহলে হাদীসগণ ও দেওবন্দের আলিমগণই এই উপাধি বেশি লাভ করেছেন। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর অন্যতম শিষ্য ও সমসাময়িক সংস্কারক মীর নেসার আলী ওরফে তিতুমির (১৭৮২-১৮৩১) এবং সমকালীন অন্য সংস্কারক হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। এদেরকেও ওহাবী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এদের আন্দোলন ও প্রতিরোধকে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়েছে।

বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী 'ইসলামী সন্ত্রাস' বা জঙ্গিবাদের নেতৃত্বে রয়েছেন উসামা বিন লাদিনের মত সৌদি বংশোদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। সৌদি আরবের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা এদের অর্থায়ন করেন বলে শোনা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত উপমহাদেশে আহলে হাদীস ও দেওবন্দী-পদ্ধতির কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের এর সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা শোনা যায়। এছাড়া এদের মধ্যে কবর-মাযার ইত্যাদির বিরোধিতা দেখা যায়। সর্বোপরি এরা নিজেদের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য মৌখিক প্রচার ছাড়াও অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন। এজন্য অনেক গবেষক মনে করেন যে, ওহাবী মতবাদের প্রসারই বর্তমান জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ।

তবে এখানে লক্ষণীয় যে, উসামা বিন লাদিন-এর আন্দোলন-এর গোড়া পত্তন হয় সৌদি-ওহাবী রাষ্ট্রের বিরোধিতার মাধ্যমে। তাঁর অনুসারীগণ তথাকার রাজতন্ত্র, মার্কিন সৈন্য, অনাচার ইত্যাদির বিরোধিতা করেন এবং সৌদি রাষ্ট্র ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম তাঁরা অব্যাহত রেখেছেন। এছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের বংশধরসহ সকল সৌদি ওহাবী আলিম বিন লাদিনের আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার।

সর্বোপরি, বিভিন্ন দেশের সংস্কারমূলক আন্দোলন বা প্রতিরোধ আন্দোলনকে 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করার কোনো ভিত্তি নেই। বস্তুত মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ও তাঁর আদর্শ প্রাপ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে তুর্কি খিলাফতের প্রচার ও বৃটিশ সরকারের সুযোগসন্ধানের কারণে। ওহাবী মতবাদ ও আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে একান্তই একটি আঞ্চলিক বিষয় ছিল। অন্যান্য মুসলিম দেশের সংস্কার-প্রতিরোধ ও ধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মতই ভালমন্দ মেশানো একটি বিষয়। অন্যান্য দেশে মুসলিমগণ তাদের পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। যেহেতু ওহাবীগণ ও অন্যান্য দেশের মুসলিমগণ সকলেই একই সূত্র, অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইসলামী ফিক্‌হ ও ইসলামের ইতিহাস থেকে নিজেদের মতামত সংগ্রহ করেছেন, সেহেতু তাদের মতামত ও কর্মের মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক। এ জন্য সকল কৃতিত্ব মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে দেওয়ার কোনো কারণ নেই।

আমরা জানি যে, আফগানিস্থান ও ইরাকে বিন লাদিনের মতবাদ বা জঙ্গিবাদ প্রসার লাভ করেছে। আর এই দুটি দেশই ঘোর ওহাবী বিরোধী। আফগানিস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠি হানাফী মাযহাবের কঠোর অনুসারী, পীর মাশাইখদের ভক্ত এবং ওহাবীদের বিরোধী। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের দীর্ঘ শাসনামলে ওহাবী বা অন্য যে কোনো সংস্কারমুখী আলিম ও মতবাদকে কঠোরভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। শুধুমাত্র পীর-মাশাইখ ও সূফীদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোরতা অবলম্বন করা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই দেশে জঙ্গিবাদের প্রসার থেকে বুঝা যায় যে, জঙ্গিবাদের কারণ অন্য কোথাও নিহিত রয়েছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, সন্ত্রাসীদের জাতি, ধর্ম গোত্র ইত্যাদিকে ঢালাওভাবে 'সন্ত্রাসের' কারণ বা চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা সঠিক নয়। এতে সন্ত্রাস দমনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, কোনো, জাতি, ধর্ম বা গোত্রের সকল মানুষকে তো আর ঢালাওভাবে বিচার করা যায় না। জঙ্গিবাদের দায়িত্ব 'ওহাবী মতবাদের' উপর চাপানোর বড় বিপত্তি হলো, এসে সমস্যা সমাধানের পথ হারিয়ে যাবে। কেননা সৌদি ওহাবীদের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন, কারণ জঙ্গিবাদ তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। আর অন্য কোনো দেশের কেউ নিজেকে ওহাবী বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু প্রায় সকল ধর্মীয় দলই বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত।

আলোচিত চতুর্থ কারণ: ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র

বিশ্বের সর্বত্রই সাধারণ আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী দলসমূহ জঙ্গিবাদের বিরোধিতা করছেন এবং নিন্দা করছেন। সাধারণভাবে তাঁরা উপরের তিনটি কারণকে জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ বলে স্বীকার করেন না। রবং তাঁরা দাবি করেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কারণেই এই জঙ্গিবাদের উত্থান। ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, ইসলামী দেশগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নতি বন্ধ করতে এবং এ সকল দেশে সামরিক আধিপত্য বিস্তার করতেই তারা গোপন অর্থায়নে কিছু মুসলিম যুবককে বিভ্রান্ত করে এরূপ জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করেছেন।

www.assunnahtrust.com

তাঁরা তাদের এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেন না, তবে অনেক যুক্তি পেশ করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, এই বোমাবাজি, অশান্তি, সন্ত্রাস এগুলি মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে কখনো দেখা যায় নি। 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পূর্বে বিগত দেড় হাজার বৎসর ধরে কখনোই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে 'জিহাদ' নামে এরূপ সন্ত্রাস কখনোই দেখা যায় নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও কোনো মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলগত ভাবে কাউকে গুপ্ত হত্যা করেছে, কারো বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে.... ইত্যাদির কোনো নযির আমরা দেখতে পাই না। 'সভ্যতার সংঘাত' থিওরি আবিষ্কারের পরে পাশ্চাত্য বিশ্ব নিজ প্রয়োজনেই এই অবস্থা তৈরি করে নিয়েছে।

দীর্ঘ অর্ধ সহস্র বৎসর যাবৎ ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ইউরোপীয় খৃস্টানগণ। ১ম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ক্রুসেডের সমাপ্তি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন তারা। বিংশ শতাব্দির ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত সেভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরে তারা হিসাব নিকাশ পাল্টে ফেলেন। তারা 'সভ্যতার সংঘাতের' থিওরী উপস্থাপন করেন। তারা ভালভাবেই উপলব্ধি করেন যে, মুসলিম বিশ্বকে তার নিজের গতিতে অগ্রসর হতে দিলে ২১শ শতকের প্রথমার্ধেই মুসলমানগণ 'বিশ্ব শক্তিতে' পরিণত হবে। অর্থনৈতিক স্থিতি, প্রযুক্তিগত শক্তি ও সমর শক্তিতে তারা শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং তাদের 'নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরানোর' কোনো সুযোগ থাকবে না। মুসলিম উম্মাহকে ঠেকাতে হলে তাদেরকে আঘাত করতে হবে।

কিন্তু আঘাত তো কোনো 'কারণ' ছাড়া করা যায় না। স্বভাবতই কোনো মুসলিম দেশই পাশ্চাত্যের সাথে কোনো সংঘাতে যেতে রাজি নয়। কিন্তু সংঘাত না হলেও তো কাজ উদ্ধার করা যাচ্ছে না। বিশেষত দুর্বলকে সংঘাতের মধ্যে নামাতে পারলে বিজয় নিশ্চিত থাকে। এজন্যই তাঁরা এই জঙ্গিবাদের জন্ম দিয়েছেন।

এ সকল মুসলিম পণ্ডিত আফগান জিহাদকে অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেন। সোভিয়েত আগ্রাসনের প্রতিবাদে আফগানিস্থানের মুসলিম জনগোষ্ঠি প্রতিরোধ শুরু করে। আমেরিকা এই সুযোগে এ সকল প্রতিরোধ যোদ্ধাদেরকে অস্ত্র, ট্রেনিং, প্রযুক্তি ও সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে এগিয়ে নেয়। সারা বিশ্বে এদের পক্ষে প্রচার চালায়। এরপর তারা তাদেরকে উস্কানির মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করে। তারা বেপরোয়া হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলেন। পরিত্যক্ত ও উত্তেজিত এ সকল মানুষ আবেগ তাড়িত হয়েও অনেক কাজ করতে থাকেন। এছাড়া এ সকল 'মুজাহিদ'দের মধ্যে আমেররিকার নিজস্ব অনুচর রয়েছে। যারা এদেরকে 'সংঘাতের পথে' যেতে প্ররোচিত করছে। এরা জিহাদ ও কিতাল বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলির অপব্যাখ্যা করে মুসলিম উম্মাহকে 'প্রিম্যাচিউরড' সংঘাতের পথে যেতে উস্কানি দিচ্ছে। এভাবে সারা মুসলিম বিশ্বে 'জিহাদের' বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

'ইসলামপন্থী'দের এই দাবির যুক্তি যত জোরালোই হোক তার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। এছাড়া এই দাবিও সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ সহায়তা করে না। সর্বোপরি, শত্রু তো শত্রুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেই। যদি কেউ সত্যিই ইসলামের শত্রু হন তবে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। এজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া বা তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা অর্থহীন কর্ম। আমাদের দেখতে হবে কি কারণে মুসলিম যুবকগণ তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন। কারণগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির প্রতিকার না করতে পারলে আমাদের দোষারোপ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁদের ষড়যন্ত্র সফলতা লাভ করবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় যে, উপর্যুক্ত চারিটি বিষয়কে বাদ দিয়ে জঙ্গিবাদের উত্থান ও প্রসারের পিছনে কার্যকর অন্যান্য কারণ সন্ধান করা আমাদের প্রয়োজন। বস্তুত ইসলামের নামে সন্ত্রাসের উত্থানের পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। কোনো বিষয় সন্ত্রাস উস্কে দিচ্ছে, কোনো কোনো বিষয় জঙ্গিবাদীরের প্রচারণা ইসলাম-প্রেমিক সরল-প্রাণ যুবক-যুবতীদের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারছে। কারণগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির প্রতিকার করতে পারলে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে তা সহায়ক হবে বলে মনে হয়। এগুলির মধ্যে কিছু কারণ সৃষ্টি করেছেন অমুসলিমগণ এবং কিছু কারণ সৃষ্টি করেছেন মুসলিমগণ। মুসলিম সৃষ্ট কারণগুলির মধ্যে কিছু রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক এবং কিছু ধর্মীয়। এখানে এই জাতীয় কিছু সাম্ভব্য কারণ আলোচনা করছি।

(১) বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন

ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানের প্রধান কারণ বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উপর নির্বিচার অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ। ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, ইরাক, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, চীন ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্বিচার জুলুম, অত্যাচার ও জাতিগত নিধনযজ্ঞ (ethnic cleansing) চলছে। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের অদম্য আবেগই জঙ্গিবাদের জন্ম দিচ্ছে। মানুষ যখন নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে আইনগতভাবে কিছুই করতে না পারে তখন বে-আইনীভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে এবং তার বে-আইনী কর্মকে 'আদর্শিক' ছাপ দেয়। এছাড়া সারা বিশ্বের মুসলিম মানস এই নিধনযজ্ঞের অবসান ও মুসলিম সভ্যতার বিজয় কামনা করছে। জঙ্গিবাদীরা এদেরকে সহজেই বুঝাতে পারছে যে, তাদের পথই নিধনযজ্ঞের অবসানের ও বিজয়ের পথ। এক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধান বিচার, আলিমদের মতামত, ফলাফলের বিচার ইত্যাদির চেয়ে আবেগই বেশি কার্যকর।

মার্কিন সরকারের হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ গ্রহণ বা জুলুমের প্রতিকার করতে আবেগী যুবক সাধারণ মার্কিন নাগরিককে বা মার্কিনীদের সাথে সহযোগী বলে অন্য কোনো দেশ ও ধর্মের কোনো মানুষকে হত্যা করেন। এভাবে তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কঠিন অন্যায় ও পাপের মধ্যে নিপতিত হন।

এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়: (১) ইসলাম অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় পদ্ধতিতে করতে অনুমতি দেয় না। (২) ইসলাম একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি দেয় না, (৩) ইসলাম কোনো ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠিকে বিচার বা শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণের অনুমতি দেয় না। এজন্য প্রাজ্ঞ আলিমগণ এ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে, শান্তিপূর্ণভাবে সহিংসতা বর্জন করে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনের উৎসাহ দেন। কিন্তু আবেগী যুবকের কাছে তাদের মত দুর্বলতা বা দালালি বলে মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে 'আধুনিক অর্ধ-আলিম ধর্মগুরুদের' 'ফাতওয়া'

www.assunnahtrust.com

তাদের কাছে যুগোপযোগী, সঠিক ও দ্রুত ফললাভের সহায়ক বলে মনে হয়। এভাবেই জঙ্গিবাদের উত্থান ও প্রসার ঘটতে থাকে।

(২) বেকারত্ব ও হতাশা

উপরের ক্ষোভ সকল মুসলিম দেশে বিদ্যমান থাকলেও জঙ্গিবাদী কার্যক্রম সকল দেশে সমানভাবে বিস্তার লাভ করেনি। ইন্দোনেশিয়ায় যেরূপ সন্ত্রাসী কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়, মালয়েশিয়াতে তা পাওয়া যায় না, অথচ ইসলামী শিক্ষার বিস্তার, মাদ্রাসার সংখ্যাধিক্য এবং আমেরিকা ও পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাবে মালয়েশিয়াতে বেশি। এর বড় কারণ সম্ভবত মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পাশ্চাত্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের সুস্পষ্ট মতামত। কর্মব্যস্ত ও পরিতৃপ্ত মানুষের মনে ক্ষোভ বা আবেগ বেশি স্থান পায় না। এছাড়া রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে তাদের মনের আবেগ প্রতিধ্বণিত হয়। ফলে তা প্রকাশের জন্য বিকৃত পথের সন্ধান করে না। পক্ষান্তরে বেকার, সামাজিক বৈষম্য বা প্রশাসনিক অনাচারের শিকার মানুষের মনের ক্ষোভ ও হতাশাকে এ সকল আবেগ আরো উস্কে দেয়। এছাড়া এইরূপ মানুষকে সহজেই বুঝানো যায় যে, এভাবে দুই-চারিটি বোমা মারলে বা মানুষ খুন করলেই তোমর মত অগণিত মানুষের বেকারত্ব বা অত্যাচার শেষ হয়ে শান্তির দিন এসে যাবে।

(৩) আধুনিক অর্ধ-আলিম ধর্মগুরুদের উত্থান

কুরআনের পরিপূর্ণ অধ্যয়ন, বিশাল হাদীস ভাণ্ডারের সকল হাদীস অধ্যয়ন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহচর-সাহাবীগণের কর্ম, চিন্তা, মতামত ও কুরআন-হাদীস ব্যাখ্যার প্রক্রিয়া অধ্যয়ন ও সমস্যা সমাধানে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর নেতৃস্থানীয় আলিম, ফকীহ ও ইমামদের মতামত ও কর্মধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভের পরেই একজন মানুষ প্রকৃত আলিম ও ফকীহ বলে গণ্য হন এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রিয় সমস্যার ক্ষেত্রে ইসলামী 'ফাতওয়া' বা সিদ্ধান্ত ও সমাধান দানের যোগ্যতা অর্জন করেন। যুগে যুগে এরূপ আলিমগণই মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। স্বভাবতই এরূপ আলিমদের সংখ্যা সমাজে কম থাকে। এজন্য মুসলিম উম্মাহর আলিমগণের রীতি হলো, জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে সমকালীন প্রাজ্ঞ আলিমগণের মতামত গ্রহণের পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রখ্যাত আলিমগণের মতামতের অনুসন্ধান ও তাদের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান।

ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস। যে কোনো ব্যক্তি কুরআন-হাদীস পাঠ করলে ইসলাম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করবেন। ইসলাম সকলকেই এভাবে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু কখনোই সকলেই 'ফাতওয়া' বা সিদ্ধান্ত প্রদানের অনুমতি দেয় না। শুধু কুরআনের কিছু আয়াত বা কিছু হাদীস পাঠ করে নিজের বুদ্ধি ও আবেগের রঙে রঞ্জিত করে 'ফাতওয়া', সিদ্ধান্ত বা সমাধান প্রদান করার প্রবণতা ভয়ঙ্কর।

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম জঙ্গিবাদী ঘটনার মূল কারণ ছিল এই প্রবণতা। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ) ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উসমান ইবনু আফ্ফান (রা) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে হযরত আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নররগণ আলীর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা) নিযুক্ত সিরিয়ার গভর্নর হযরত মু'আবিয় (রা) আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোরালো হয়ে গৃহ যুদ্ধে রূপান্তারিত হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন।

এই পর্যায়ে আলীর (রা) অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' বলা হয়। এরা সকলেই ছিল অত্যন্ত ধার্মিক, রাতদিন কুরআন পাঠকারী ও রাতভর তাহাজ্জুদ আদায়কারী আবেগী মুসলমান, যারা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও বিধান ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর বিধান হলো, ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়তে হবে। কাজেই এ বিষয়ে মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান অবৈধ। এ কারণে তারা আলী, মু'আবিয় ও তাদের সঙ্গী সাহাবীগণসহ সকল মুসলমানকে কাফির ঘোষণা দিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে এই মর্মে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। এদের ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। পাশাপাশি এদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ছিল ভয়ঙ্কর। অনেক নিরপরাধ অযোদ্ধাসহ হাজার হাজার মুসলিমের প্রাণ নষ্ট হয় তাদের হিংস্রতা ও সন্ত্রাসের কারণে। আর এ সককিছুর মূল কারণ ছিল ইসলাম বুঝার ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত মনে করা এবং অধিকতর অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলিমদের মতামতকে অবজ্ঞা করা।[১]

সকল যুগেই এরূপ আবেগ তাড়িত 'ধার্মিক' ও 'ধর্মগুরু' বিদ্যমান ছিলেন। তবে সাধারণ মুসলিম সমাজে এদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কিন্তু গত অর্ধ-শতাব্দী যাবত এক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত 'আলিম' বা 'ট্রেডিশনাল উলামা'র পরিবর্তে 'আধুনিক শিক্ষিত ধর্মীয় নেতাদের' আকর্ষণীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বিভিন্ন মুসলিম সমাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় কার্যকর:

[১] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৬৫-১৬৬

www.assunnahtrust.com

(ক) অনেক আধুনিক শিক্ষিত শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা সাধারণ মানুষ জীবনের মাঝপথে এসে ধর্ম বিমুখতা থেকে ধার্মিকতার দিকে ফিরেন। এ পর্যায়ে তাঁরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস চর্চা শুরু করেন। এরা মূলত মেধাবী। এক সময়ে এদের অনেকে তাঁদের মেধা, মনন ও বুদ্ধি দিয়ে কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও 'ফাতওয়া' দিতে শুরু করেন। স্বভাবতই তাঁরা বিশাল হাদীস ভাণ্ডার, সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি ও পূর্ববর্তী আলিমগণের মতামত কিছুই জানেন বা জানার গুরুত্বও অনুভব করেন না। মূলত তাঁদের জানা কুরআনের আয়াতগুলি এবং সীমিত কিছু হাদীসের শাব্দিক অর্থের সাথে নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মননশীলতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে থাকেন। তাঁদের বাগ্মিতা, আধুনিক জগত ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের গভীর জ্ঞান ইত্যাদি সাধারণ মুসলিমদেরকে আকৃষ্ট করে।

(খ) গত প্রায় অর্ধ-সহস্র বৎসর যাবৎ মুসলিম উম্মাহর সকল দেশেই ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক মানগত অবনতি ঘটেছে। বিশেষত উপনিবেশাধীন সমাজে এবং এর পরে 'ইসলামী শিক্ষার' কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মাদ্রাসগুলির শিক্ষার মান কমেছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমর্থনের অভাব, মেধাবী শিক্ষার্থীর অভাব, গবেষণা উপকরণ ও গবেষণা পরিবেশের অভাব ইত্যাদি কারণে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া অধিকাংশেরই ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা খুবই কম। এদের অনেকেই উপর্যুক্ত 'আধুনিক মুফতীদের' চেয়ে ইসলামী জ্ঞানে অনেক দুর্বল। অনেক সময় এইরূপ 'মাদ্রাসা শিক্ষিত' মানুষরাও উপর্যুক্ত 'আধুনিক মুফতীগণের' সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হন।

(গ) গত প্রায় শতাব্দীকাল ধরে মুসলিম দেশগুলি উপনিবেশ ও উপনিবেশ-উত্তর অনাচার, ইসলাম বিরোধী প্রচার প্রচারণা ও কর্মকাণ্ডের মুখোমুখি। তদুপরি গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন ও মুসলিমদের উপর অত্যাচারের বিষয়টি উপরে আলোচনা করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম-প্রিয় আবেগী যুবমানস এ সকল জুলুম, অনাচার ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের ত্বরিত প্রতিশোধ বা অবসান চায় এবং এজন্য সঠিক ইসলামী সিদ্ধান্ত তালাশ করে। এক্ষেত্রে এ সকল 'অর্ধ-আলিম' পণ্ডিতগণ 'গরম' ও 'ত্বরিত' সমাধানের পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। পক্ষান্তরে ট্রেডিশনাল আলিমগণ এক্ষেত্রে নরম সমাধান প্রদান করেন। এজন্য সাধারণত আবেগী যুবকগণ এ সকল আলিমকে আপোষকামী, দালাল বা অনভিজ্ঞ এবং আধুনিক মুফতীদের মতামতই সঠিক বলে মনে করেন।

(ঘ) উপরের বিষয়গুলির ভিত্তিতে ইসলামী দা'ওয়াত, আন্দোলনে লিপ্তদের মধ্যে একটি কথা গত অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ মহাসত্যের রূপ পরিগ্রহন করেছে, তা হলো, মাদ্রাসা থেকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা লাভ করা যায় না। বরং মাদ্রাসা না পড়া আধুনিক শিক্ষিত মানুষের অনুবাদ গ্রন্থাদি পাঠের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন।

(ঙ) মাদ্রাসায় সাধারণত সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর সন্তানেরা লেখাপড়া করেন এবং তাঁরাই আলিম হন। এরা সাধারণত 'নরম' ও অতি বিনয়ী ও দুর্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন। পক্ষান্তরে উপর্যুক্ত আধুনিক মুফতীগণ সাধারণত অত্যন্ত দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতার অধিকারী। ফলে বিভিন্ন ইসলামী দল ও ইসলামী কর্মের নেতৃত্ব থাকে মূলত দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতে। এ সকল দলের 'আলিমগণ' মূলত এদের অনুসারী মাত্র।

বর্তমান বিশ্বের সকল দেশে প্রায় সকল 'ইসলামী বুদ্ধিজীবী' ও ইসলামী দলের নীতি নির্ধারকগণ এই প্রকারের আধুনিক শিক্ষিত 'গুরু'। ইসলামী জঙ্গিবাদের সুপরিচিত নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই এই পর্যায়ের। এরাই এ সকল কর্মকাণ্ডের 'তাত্ত্বিক গুরু'। এদের অনেকের ধার্মিকতা বা আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে এদের সীমাবদ্ধতা খুবই বেশি। সবচেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয় হলো, নামাযের সূরা পাঠ বা হাত তোলার মত বিষয়ে এ সকল আধুনিক নেতা প্রসিদ্ধ আলিম ও ইমামদের মতামতের উপর নির্ভর করেন ও সেগুলিকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু কাউকে ধর্মত্যাগী, অমুসলিম বা ইসলামের শত্রু বলে ঘোষণা করা, যুদ্ধ ঘোষণা, মানুষ হত্যা, অন্যের সম্পদ নষ্ট করা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর 'বান্দার হক্ক' বা মানবাধিকারের সাথে জড়িত বিষয়ে তাঁরা কারো মতামতের তোয়াক্কা না করে নিজেদের বুদ্ধিমত ফাতওয়া দেন। এক্ষেত্রে সুপরিচিত আলিমগণ 'নরম' মতামত প্রকাশ করলে তাদেরকে অজ্ঞ আপোষকামি বা দালাল বলে মনে করেন।

(৪) জিহাদ পরিভাষার বিকৃতি

জঙ্গিবাদের প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হলো 'জিহাদ' শব্দের অপব্যবহার করে ইসলাম প্রেমিক মানুষদেরকে প্রতারিত করা। এজন্য বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক. জিহাদ ও কিতাল

'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, শ্রম ব্যয় ইত্যাদি। আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রতিষ্ঠার সকল প্রকার শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে 'জিহাদ' বলা হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্‌হে জিহাদ বলতে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। আর এই যুদ্ধেরই নাম হলো কিতাল। কুরআন ও হাদীসে জিহাদ ও কিতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কতল অর্থ হত্যা করা। আর কিতাল অর্থ পরস্পরে যুদ্ধ। এজন্য জিহাদ বা কিতালের মূল শর্ত হলো সামনাসামনি 'যুদ্ধ'। পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা এগুলি কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়। মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক 'কিতাল' করেছেন। দুই-একটি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে যথাসম্ভব কম রক্তপাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গোপন অভিযান পারিচালনা করা হলেও যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নি সংযোগ, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কখনোই তিনি করেন নি বা করার অনুমতি প্রদান করেন নি। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও অযোদ্ধাকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

ক. ইসলামে কতল বা হত্যা

ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু হলো মানব জীবন। মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। শুধুমাত্র 'আইনানুগ বিচার' অথবা 'যুদ্ধের ময়দান' ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করা, সন্ত্রস্থ করা, আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া বা কোনোভাবে কারো ক্ষতি করা কঠিনতম হারাম কর্ম। এই বিধান ধর্মনিরপেক্ষ। কোনো ধর্মের কোনো মানুষকেই উপরের দুটি অবস্থা ছাড়া হত্যা করা,

www.assunnahtrust.com

আঘাত করা বা কষ্ট দেওয়া যাবে না। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে 'মানব রক্ত' কঠিনতম হারাম। একমাত্র সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে 'মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই' একজন মানুষের হত্যা বৈধ করা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজনে বিশেষ মুহূতে মানুষের রক্তপাত বৈধ করা হয়। শুধু দুইটি ক্ষেত্রে তা হয়: বিচার ও যুদ্ধ। বিচারের ক্ষেত্রে নরহত্যা, বিবাহিতের ব্যভিচার ও সেচ্ছায় বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করার পরে ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান আছে। এ জন্য অনেক কঠিন শর্ত রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো বিচারক সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার। অপরাধের পূর্ণতার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও আর মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যাবে না।[১]

এই বিচার অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যথাযথ বিচারকের আদালতে যথাযথ সাক্ষ্য, প্রমাণ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে। এই প্রক্রিয়ার বাইরে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান বিচারপতিও কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না। উমার (রা) আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রা) -কে বলেন, "আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচারের অপরাধে বা চুরির অপরাধে রত দেখতে পান তাহলে তার বিচারের বিধান কী? (নিজের দেখাতেই কি বিচার করতে পারবেন?)" আব্দুর রাহমান (রা) বলেন, "আপনার সাক্ষ্যও একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষ্যের সমান।" উমার (রা) বলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন।" অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান নিজের হাতে বিচার তুলে নিতে পারবেন না। এমনকি তার সাক্ষ্যেরও অতিরিক্ত কোনো মূল্য নেই। রাষ্ট্রপ্রধানের একার সাক্ষ্যে কোনো বিচার হবে না। বিধিমোতাবেক দুইজন বা চারজন সাক্ষীর কমে বিচারক কারো বিচার করতে পারবেন না।

অন্য এক ঘটনায় উমার (রা) রাত্রে মদীনায় ঘোরাফেরা করার সময় একব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান। তিনি পরদিন সকালে সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পান তাহলে তিনি কি শাস্তি প্রদান করতে পারবেন? তখন আলী (রা) বলেন, কখনোই না। আপনি ছাড়া আরো তিনজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী যদি অপরাধের সাক্ষ্য না দেয় তাহলে আপনার উপরে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।[২]

গ. ইসলামে কিতাল বা যুদ্ধ

কিতাল বা পারস্পরিক যুদ্ধের ক্ষেত্রেও ইসলাম অগণিত শর্ত আরোপ করেছে। সর্বপ্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিতাল/জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম দা'ওয়াত বা প্রচার। কিতাল হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাওয়াতের মাধ্যমে 'ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নিতে আগ্রহী হন। তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের বিরোধিতাকারীরা এই নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের জান, মাল ও ধর্মীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়। এজন্য জিহাদ বা কিতাল বৈধ হওয়ার জন্য 'রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রতি বা 'ইমাম' শর্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

"রাষ্টপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[৩]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براكان أو فاجرا (لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل

"রাষ্ট্রপ্রধান ধার্মিক হোক আর অধার্মিক হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর আনুগত্যে জিহাদ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব।" অন্য বর্ণনায়: "জালিম শাসকের জুলুম ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায়পরায়ণতা কোনোটিই জিহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধা হবে না।"[৪]

জিহাদ বা কিতালের অন্য শর্ত হলো, শত্রুপক্ষ রাষ্ট্র আক্রমণ করবে বা তার নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে:

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[৫]

কিতালের অন্য শর্ত হলো, শুধুমাত্র যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালবাসেন না।"[৬]

এই অর্থে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কাউকে হত্যা করার অগণিত শর্ত রয়েছে। যুদ্ধকারী

---

[১] বাইহাকী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ

[২] আল-কানযুল আকবার ১/২২৭

[৩] বুখারী ও মুসলিম

[৪] আবূ দাউদ ৩/১৮।

[৫] সূরা ২২: হজ্জ, আয়াত ৩৯।

[৬] সূরা ২: বাকারা, আয়াত ১৯০।

www.assunnahtrust.com

যুদ্ধের জন্য সম্মুখে অস্ত্রসহ উপস্থিত থাকবে। যুদ্ধের আগে তাকে সন্ধি, আত্মসমর্পন, ইসলামগ্রহণ, জিযিয়া প্রদান ইত্যাদির সুযোগ দিতে হবে। এ সকল শর্ত সহ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের সময় একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তবে তাকে আর আঘাত করা যাবে না। ... ইত্যাদি অগণিত শর্ত বিদ্যমান। একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করার- একান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও যতগুলি আইনানুগ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সবগুলিতেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না। এখানে একটি তুলনা দেখুন। বাইবেলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বেসামরিক মানুষদের এবং বিশেষ করে সকল পুরুষ শিশুকে এবং সকল বিবাহিত নারীকে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র কিশোরী কুমারী মেয়েদেরকে ভোগের জন্য জীবিত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো দেশ যুদ্ধ করে দখল করতে পারলে তার সকল পুরুষ অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও পশুদেরকে ভোগের জন্য রাখতে হবে। আর সেই দেশ যদি ইহূদীদের দেশের নিকটবর্তী কোনো দেশ হয় তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তথাকার সকল মানুষকে হত্যা করতে হবে। বাইবেলে বলা হয়েছে:

"Kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him. But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves."[1]

"And when the LORD the God hath delivered it tnto thine hands, thou shalt smite every male thereof with the edge of the swore; 14 but the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee. 15 Thus shalt thou do unto all the cities which are very far from thee, which are not of the cities of these nations. 16 But of the cities of these which the FORD thy God doth give thee for an inheritance, thou shalt save alive nothing that breatheth; 17 but thou shalt utterly destroy them."[2]

পক্ষান্তরে হাদীসের নির্দেশ হলো:

لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع/ ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تغورن عينا ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تغدروا ولا تغلوا/ لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين/ لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا مريضا ولا راهبا ولا تقطعوا مثمرا ولا تخربوا عامرا ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا لمأكل ولا تغرقوا نخلا ولا تحرقوه/ ولا تخربوا عمرانا ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع

যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মজাযককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো জনপদ ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী- কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।[৩]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কতল ও কিতাল বা হত্যা ও যুদ্ধ মূলত ইসলামে একটি নিষিদ্ধ কর্ম। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোনো কাফিরকে হত্যা করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ও অন্যান্য সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা অমুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবেন না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"[৪]

শত্রু রাষ্ট্র বা শত্রুতায় লিপ্ত অমুসলিমদের সাথেও পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে:

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا

[১] Numbers 31/17-18

[২] (Deuteronomy 20/13-16)

[৩] (বিস্তারিত বর্ণনাগুলির জন্য দেখুন বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯/৯০)

[৪] (বুখারী, মুসলিম)

www.assunnahtrust.com

"তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দিয়েছিল বলে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে।"[১]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে

ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا

"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।"[২]

ঘ. জিহাদ বনাম সন্ত্রাস

এভাবে আমরা দেখছি যে, সন্ত্রাস ও জিহাদের মূল পার্থক্য হলো, জিহাদ রাষ্ট্র কতৃক পরিচালিত যুদ্ধ। আর সন্ত্রাস ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কতৃক পরিচালিত যুদ্ধ বা সহিংসতা। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, জিহাদ ও কিতাল আইনানুগভাবে পরিচালিত যুদ্ধ। যেখানে শুধু যুদ্ধে জাড়িত যোদ্ধাদেরকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে। এই বিধান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আর সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে যোদ্ধা-অযোদ্ধা নির্বিচারে হত্যা করা হয়, যা ইসলামে সবচেয়ে ঘৃণিত একটি অপরাধ।

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এজন্য কুরআন ও হাদীসে মানব জীবনের সকল দিকের বিধিবিধান বিদ্যমান। কোনো বিধান ব্যক্তিগতভাবে পালনীয়, কোনো বিধান সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। প্রত্যেক বিধান পালনের জন্য নির্ধারিত শর্তাদি রয়েছে। কুরআনে 'সালাত' প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার কুরআনে 'চোরের হাত কাটার', 'ব্যভিচারীর বেত্রাঘাতের' ও জিহাদ বা কিতালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ইবাদতটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয়। অন্য কেউ পালন না করলেও মুমিনকে ব্যক্তিগভাবে পালন করতেই হবে। কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্দেশটি 'রাষ্ট্রীয় ভাবে' পালনীয়। কখনোই একজন মুমিন তা ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠিগতভাবে পালন করতে পারেন না।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো ইবাদতের শর্তাবলি কুরআনে কখনোই একত্রে বা একস্থানে উল্লেখ করা হয় নি। এছাড়া অধিকাংশ ইবাদতের সকল শর্ত কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। কুরআন ও হাদীসের সামগ্রিক বিধান বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামগ্রিক জীবন ও এ সকল নির্দেশ পালনে তাঁর রীতি-পদ্ধতি থেকেই সেগুলির শর্ত ও পদ্ধতি বুঝতে হবে। দুই একটি আয়াত বা হাদীস সামনে রেখে মনগড়া অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমেই বিভিন্ন ইসলামী পরিভাষার বিকৃতি ঘটানো হয়। জঙ্গিবাদীরা এভাবেই জিহাদ শব্দের বিকৃতি ঘটিয়েছে।

কুরআনে বারংবার সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل

"সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে।"[৩]

এই নির্দেশের উপর নির্ভর করে যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় সালাতে রত হন তবে তিনি নিজে যতই দাবি করুন, মূলত তা ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাদীস শরীফে 'সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাত্রি পর্যন্ত' সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের বৈধ ও অবৈধ সময় চিহ্নিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় অবৈধ করেছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে কুরআন কারীমের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা আমাদেরকে ইবাদতের নামে পাপের মধ্যে লিপ্ত করে।

অনুরূপভাবে কুরআনে 'কিতালের' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এই ইবাদত পালনের অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যন্মধ্যে কতিপয় শর্ত আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। কেউ যদি সেগুলি পূরণ না করে হত্যা, খুন, রক্তপাত ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়ে এগুলি জিহাদ বলে দাবি করেন, তবে তা কখনোই ইসলামী ইবাদাত বলে গণ্য হবে না, বরং তা পাপ ও হারাম কর্ম বলে গণ্য হবে।

শর্ত পূরণ না করে সালাত আদায় করার চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর পাপ শর্ত পূরণ ছাড়াই কতল বা কিতালে লিপ্ত হওয়া। সালাত ও কিতালের মধ্যে পার্থক্য হলো, সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করলে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হলেও, তাতে কোনো বান্দার হক নষ্ট হবে না। কিন্তু কিতালের সাথে 'বান্দার' হক জাড়িত। কাউকে ভীতি প্রদর্শন করা, রক্তপাত করা, হত্যা করা, সম্পদ নষ্ট করা কঠিনতম কবীরা গোনাহ, যা স্বয়ং আল্লাহও ক্ষমা করেন না। কাজেই ইসলামী রাষ্টের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে কাফির রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সাথে ঘোষিত ও আইনানুগ যুদ্ধের বাইরে যদি কেউ হত্যা, আঘাত, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হন, তবে ইবাদত কবুল না হওয়া এবং গোনাহগার হওয়া ছাড়াও তিনি বান্দার হক্ক নষ্ট করার ভয়ঙ্করতম পাপে লিপ্ত হবেন।

ঙ. ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ ও সন্ত্রাস

ইসলামের ইতিহাসে জিহাদের নামে সন্ত্রাসের প্রথম উদ্ভাবনা করেন খারিজী সম্প্রদায়। তাদের বিষয়ে আগেই উল্লেখ করেছি যে, তারা 'আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম চলবে না' এই দাবিতে আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ইসলামী আইন বা আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। এদের মূল বিভ্রান্তিই ছিল 'জিহাদ' বা কিতালকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে 'গোষ্ঠি' বা গ্রুপের হাতে নিয়ে যাওয়া। তাদের 'ভার্সন' অনুসারে যাদেরকে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বলে মনে করত তাদের তাদের সাথে তারা যুদ্ধ করত। এখানে লক্ষণীয় যে, এই বিভ্রান্ত 'খারিজী' সম্প্রদায় 'যুদ্ধ' করেছে। কিন্তু তারা 'গুপ্ত হত্যা' করেনি। পক্ষান্তরে আরেকটি বিভ্রান্ত সম্প্রদায় 'গুপ্তহত্যা' করত। এরা ছিল বাতিনী শিয়া সম্প্রদায়। এরা নিজেদের ভার্সন অনুসারে 'ইসলাম' প্রতিষ্ঠার জন্য গুপ্ত হত্যা করত।

---

[১] সূরা : ৫ মায়িদা, ২ আয়াত।

[২] সূরা : ৫ মায়িদা, ৮ আয়াত।

[৩] সূরা : ১৭ বানী ইসরাঈল, ৭৮ আয়াত।

www.assunnahtrust.com

এই দুই বিভ্রান্ত সম্প্রদায় তাদের এই 'জিহাদ' মূলত কাফিরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করত না। বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত করত। তাদের বিভ্রান্তি চালু করার জন্য তারা তাদের মতের বাইরে সকল মুসলিমকে কাফির বলে ফতওয়া জারি করত। এরপর তাদের বিরুদ্ধে ঢালাও জিহাদের ফাতওয়া দিত। এরপর জিহাদের নামে ঢালাও নরহত্যা বা গুপ্ত হত্যা চালাত।

ইসলামের ইতিহাসে আমরা অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ ইত্যাদি দেখতে পাই, যেগুলি যুদ্ধের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত শর্তগুলি পুরোপুরি পূরণ করে না। এগুলি মানবীয় দুর্বলতার ফল। ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত এগুলি অবৈধ। তবে কোনো ক্ষেত্রেই যুদ্ধের ময়দানের বাইরে গুপ্ত হত্যা, নির্বিচার হত্যা ইত্যাদিতে এই দুই বিভ্রান্ত গোষ্ঠি ছাড়া কেউ জড়িত হন নি।

পরবর্তীকালের দুইটি 'জিহাদের' বিষয় আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে: সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর জিহাদ ও আফগান জিহাদ। প্রথম জিহাদে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী জিহাদের শর্তগুলি পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা পরিত্যাগ করে ভারতের ইসলামী রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের শর্ত পূরণ করেছিলেন। তিনি বৃটিশদেরকে আক্রমণকারী ও দখলদার বাহিনী হিসেবে গণ্য করে জিহাদের বৈধতার দাবি করেন।

আফগান জিহাদও শুরু হয়েছিল প্রায় একইভাবে সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণ ও জবরদখলের মুখে আফগান জনগণ আলিমদের নেতৃত্বে জিহাদ শুরু করেছিলেন। সাধারণভাবে মুসলিম বিশ্বে এই জিহাদ বৈধ জিহাদ বলেই মনে করা হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের অনেক মুসলিম যুবক এই জিহাদে অংশ গ্রহণ করে। সোভিয়েট বাহিনীর পরাজয়ের পরে এই জিহাদ আন্তঃদলীয় ও আন্তঃগোত্রীয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন যুদ্ধে অভ্যস্ত আফগান জনগণ অস্ত্রের ভাষাতেই কথা বললেন স্বদেশীয় ও স্বধর্মীয় বিরোধীদের সাথে। প্রত্যেকেই নিজের কাজকে জিহাদ এবং প্রতিপক্ষকে ইসলামের শত্রু বলে দাবি করলেন। বাইরে থেকে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ স্বভাবতই কোনো না কোনো আফগান পক্ষে থেকে একই কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অনেকে আফগান ত্যাগ করে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এসব যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের অনেকের জন্য 'অস্ত্রের ভাষা' পরিত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে যায়। এদের অধিকাংশই জিহাদের শর্তের চেয়ে জিহাদের ফযীলতের বিষয়েই বেশি জানতেন ও ভাবতেন। তারা নিজ দেশেও 'জিহাদী' পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করেন।

(৫) জিহাদ পরিভাষার অতিব্যবহার

জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত মানুষদের কথাবার্তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, গত অর্ধ শতাব্দী ধরে জিহাদ শব্দের অতিব্যবহার তাদের বিভ্রান্তির পক্ষে পরিবেশ তৈরি করেছে। ইসলামে বিভিন্ন পরিভাষার পারিভাষিক ব্যবহার ছাড়াও অনেক সময় আভিধানিক অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আভিধানিক অর্থের অতিব্যবহার অনেক সময় পারিভাষিক অর্থের বিকৃতি সহজ করে। যেমন 'সালাত'-এর আভিধানিক 'অর্থ' প্রার্থনা। যে কোনো প্রার্থনাকেই সালাত বলা যায় এবং কুরাআন-হাদীসে কখনো কখনো তা বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় 'সালাত' একটি নির্দিষ্ট ইবাদাতের নাম। সকল প্রার্থনাকেই সালাত বলে নামকরণ করলে তা বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে। মাঝে মাঝে প্রার্থনা করেই 'সালাত' কায়েম হয়ে গিয়েছে বলে হয়ত কেউ দাবি করবেন, অথবা অন্য কেউ যে কোনো প্রকারের প্রার্থনাকেই ফরয বলে দাবি করবেন, অথবা কেউ সালাতের ফযীলত বা আহকামের আয়াত ও হাদীসগুলি সকল প্রার্থনার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করবেন।

জিহাদ, ইমাম, বাইয়াত, জামা'আত ইত্যাদি সবই ইসলামের 'রাষ্ট্রীয়' বা 'রাজনৈতিক' পরিভাষা। জিহাদ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের নাম। ইমাম রাষ্ট্র প্রধানের নাম। বাইয়াত রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত্যের প্রতীক শপথের নাম। জামা'আত মুসলিম রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ জনগণ ও জনমতের নাম। এই পারিভাষিক অর্থের বাইরে আভিধানিক অর্থে এগুলির ব্যবহার অবৈধ নয়। তবে তা অনেক সময় কঠিন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

বর্তমান যুগে 'জিহাদ' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। আমরা দেখেছি যে, জিহাদ অর্থ 'প্রচেষ্টা' বা 'সর্বাত্মক চেষ্টা'। এই অর্থে ইসলাম পালনের কোনো কোনো কষ্টকর প্রচেষ্টাকে কুরআন-হাদীসে 'জিহাদ' বলা হয়েছে। যেমন 'আত্মশুদ্ধি'-কে জিহাদ বলা হয়েছে; শীতের মধ্যে নিয়মিত ওযু করা ও মসজিদে গমন করাকে 'জিহাদ' বলা হয়েছে; 'হজ্জ' পালনকে জিহাদ বলা হয়েছে বা জালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে জিহাদ বলা হয়েছে। কিন্তু এ সকল আভিধানিক ব্যবহারের বাইরে ইসলামী শরীয়তে জিহাদের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে, তা হলো ইসলামী রাষ্ট্রের সশস্ত্র যুদ্ধ। জিহাদের ফযীলত, জিহাদের বিধান, জিহাদের শর্ত ইত্যাদি যা কিছু কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিক্হ-এ বলা হয়েছে সবই এই 'পারিভাষিক জিহাদের' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বর্তমান যুগে ইসলাম প্রচার, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, 'ইসলামী আন্দোলন' ইত্যাদি বিভিন্ন ইসলামী কর্মকে ঢালাওভাবে 'জিহাদ' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। এগুলি সবই ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত এবং এগুলির প্রত্যেকটির ইসলামী শরীয়তে পারিভাষিক নাম ও বিধিবিধান রয়েছে, যেগুলি পারিভাষিক জিহাদের বিধান থেকে ভিন্ন। যারা এ সকল কর্মকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করছেন তাঁরা মূলত এগুলির গুরুত্ব বুঝাতে ও এগুলিতে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আভিধানিক অর্থে তা করছেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে, এর ফলে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। কোনো আলিম যখন দাওয়াত, দ্বীন প্রতিষ্ঠা, আন্দোলন, রাজনীতি, মিছিল ইত্যাদিকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেন, তখন তিনি কখনোই বুঝান না যে, এই কর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করা যাবে, অথবা এর বিরোধীদেরকে আঘাত করা যাবে। কিন্তু তিনি না বুঝালেও শ্রোতা, পাঠক বা সংশ্লিষ্ট অনেকেই তা বুঝছেন।

এই 'বুঝ' জঙ্গিবাদীদেরকে অত্যন্ত সহায়তা করছে। জঙ্গিবাদীদের মতাদর্শের দুটি পর্যায় রয়েছে:

প্রথমত, জিহাদকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হিসেবে দাবি করা।

দ্বিতীয়ত, জিহাদের জন্য অস্ত্রধারণ, হত্যা, মৃত্যুবরণ ইত্যাদিকে অত্যাবশ্যকীয় বলে দাবি করা।

কুরআন-হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস থেকে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রমাণ করা তাঁদের জন্য খুবই সহজ বিষয়। এজন্য তাঁদের বিভ্রান্তির মূল উৎস প্রথম বিষয়ের মধ্যে নিহিত। আমরা দেখেছি যে, পারিভাষিক 'জিহাদ' কখনোই ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ইসলামী রাষ্ট্র বা আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মাধ্যম মাত্র। কিন্তু জিহাদ শব্দের অতি-ব্যবহারে ফলে অনেকের

www.assunnahtrust.com

মনেই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, জিহাদই দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা সকলের জন্য ফরয। জঙ্গিদের প্রচারকর্ম এতে অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তারা কিছু সরলপ্রাণ আবেগী যুবককে সহজেই একথা বুঝাতে পারছে যে, জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম ফরয, জিহাদ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না। আর জিহাদ মানেই তো অস্ত্রের যুদ্ধ ও শত্রুকে হত্যা করা, কাজেই এখনই আমাদের সেই কাজে নেমে পড়তে হবে। এভাবেই একটি বিভ্রান্তি আরেকটি ভয়ঙ্করতর বিভ্রান্তির পথ উন্মুক্ত করছে।

(৬) ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন

ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে নিয়ে ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিভ্রান্তিকর ধারণা জঙ্গিবাদের জন্য ইতিবাচক ক্ষেত্র তৈরি করে। তন্মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অতি-গুরুত্ব আরোপ এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও আইন সম্পর্কে পিউরিটান ও নেতিবাচক ধারণা। অর্থাৎ মনে করা যে, বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি সবই অনৈসলামিক রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসলাম পালন হলোই না। এই ধারণার ভিত্তিতেই জঙ্গিরা ইসলাম প্রেমিক যুবকদেরকে দ্রুত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র তুলে নিতে প্ররোচিত করতে পারছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দুই প্রকারের সভ্যতা দেখতে পাই: রাষ্ট্র কেন্দ্রিক সভ্যতা ও ধর্ম কেন্দ্রিক সভ্যতা। রাষ্ট্র কেন্দ্রিক সভ্যতার পতন ঘটে রাষ্ট্রের পতনের সাথে। পক্ষান্তরে ধর্ম কেন্দ্রিক সভ্যতার সাথে রাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকলেও রাষ্ট্রই সভ্যতার মূল চালিকা শক্তি হয় না। মূলত বিশ্বাস, কর্ম ও আদর্শের উপর এর ভিত্তি থাকে। ফলে রাষ্ট্রের পতনে এই সভ্যতার পতন ঘটে না। ইসলাম দ্বিতীয় প্রকারের সভ্যতার সৃষ্টি করেছে।

অনেক সময় আবেগী মুসলিম মনে করে বসেন যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই ইসলাম; অথবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসলাম পালন হলো না। মুসলিম সমাজগুলিতে 'আধুনিক শিক্ষিত মুফতী' বা 'অর্ধ-আলিম ধর্মগুরু'-দের উত্থানের ফলে এরূপ আবেগী কথা ভাল বাজার পেয়ে গিয়েছে। বস্তুত এই চিন্তা একেবারেই বাতুল। মুমিনের দায়িত্ব আরকানে ইসলাম সহ ইসলামের অন্য সকল দায়িত্ব নিজের জীবনে পালন করা। এরপর সাধ্যানুসারে সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা বা দাওয়াত দেওয়া। প্রথম পর্যায়ের কর্ম তার উপর ব্যক্তিগত ফরয বা ফরয আইন ও তার ফলাফলের জন্য সে দায়ী। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্ম মূলত সমাজের উপর সামষ্টিক ফরয বা ফরয কিফাইয়া এবং এর ফলাফল লাভের জন্য কোনো মুসলিমই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নন।

রাষ্ট্র ব্যবস্থাসহ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া সকল দেশের সকল সমাজের মানুষদের জন্য পালনীয় প্রশস্ততা রয়েছে ইসলামে। মুসলিম-অমুসলিম সকল দেশ ও সমাজে বসবাস করে একজন মুসলিম তার ধর্ম পালন করতে পারেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তার ধর্ম পালনের জন্য শর্ত বা মূল স্তম্ভ বলে গণ্য করা হয় নি। রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইসলামের একটি অংশ। ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান আছে। তবে ইসলাম শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম নয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র যে কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হলে মুসলিম দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি ইসলাম নির্দেশিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সংশোধন করতে সচেষ্ট হতে পারেন। তবে এই চেষ্টা সফল না হলে তার দ্বীন-পালন ব্যহত হয় বা তার কোনো পাপ হয় বলে মনে করার কোনো ভিত্তি নেই।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক ধারণা হলো মুসলিম দেশগুলিকে 'অনৈসলামিক রাষ্ট্র' বলে মনে করা। মুসলিমের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে যেমন ভুলত্রুটি, পাপ ও ইসলামী বিধান লঙ্ঘন হতে পারে তেমনি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালনায়ও ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন ঘটতে পারে। খিলাফতে রাশিদার পর থেকে সকল ইসলামী রাষ্ট্রেই রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামী বিধিবিধানের কমবেশি লঙ্ঘন ঘটেছে। শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি অগণিত ইসলামী নির্দেশনা কম বা বেশি লঙ্ঘিত হয়েছে এসকল রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকগণ নিজেদেরকেই আইন বা আইনদাতা বলে মনে করেছেন। কুরআনী বিধিবিধান ও আইনকে বেপরোয়াভাবে অবহেলা করেছেন। কিন্তু কখনোই এ জন্য কোনো মুসলিম ইমাম, ফকীহ বা আলিম এ সকল রাষ্ট্রকে 'দারুল হরব', 'অনৈসলামিক রাষ্ট্র' বা 'জাহিলী রাষ্ট্র' বলে মনে করেন নি। তারা তাদের সাধ্যমত সংশোধন ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন।

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলির অবস্থা পূর্ববর্তী এ সকল মুসলিম দেশ থেকে মোটেও ভিন্ন নয়, বরং কিছুটা ভালই বলতে হয়। শাসক নির্বাচন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের পরামর্শ গ্রহণ, জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, নিরপেক্ষভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রয়োগ ইত্যাদি ইসলামী নির্দেশনা পালনের ক্ষেত্রে এ সকল রাষ্ট্র পূর্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি থেকে কিছুটা হলেও উন্নত হয়েছে। এ সকল দেশের অধিকাংশ আইন-কানুন ও বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা থেকে গৃহীত। ইসলমী বিধানের পরিপন্থী কিছু আইন-কানুনও বিদ্যমান। শাসকদের পাপ, রাষ্ট্র ব্যবস্থার পাপ বা কিছু ইসলাম-বিরোধী আইন-কানুনের জন্য কোনো রাষ্ট্রকে অনৈসলামিক মনে করা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা অশান্তি সৃষ্টি করা ইসলাম বিরোধী ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

من كره من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا (فارق الجماعة شبرا)، مات ميتة جاهلية

যদি কেউ তার শাসক বা প্রশাসকের মধ্যে এমন কোনো কিছু দেখতে পায় যা তার খারাপ লাগে, তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে (আবেগতাড়িত হয়ে বিদ্রোহ বা অবাধ্যতার পথে না যায়।) কারণ, যদি কেউ রাষ্ট্রব্যবস্থার আনুগত্যের বাইরে এক বিঘতও বেরিয়ে যায়, বা ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও সমাজের সিদ্ধান্তের বাইরে এক বিঘতও বেরিয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সে জাহিলী (অনৈসলামিক) মৃত্যু বরণ করলো।"[১]

[১] সহীহ বুখারী ৬/২৫৮৮, ২৬১২; সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৭

www.assunnahtrust.com

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة

"তোমরা হুশিয়ার থাকবে! তোমাদের কারো উপরে যদি কোনো শাসক-প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং সে দেখতে পায় যে, উক্ত শাসক বা প্রশাসক আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছেন, তবে সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার উক্ত কর্মকে ঘৃণা করে, কিন্তু আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না।"[১]

(৭) প্রতিপক্ষকে কাফির বলার প্রবণতা

জিহাদের নামে কাউকে হত্যা করতে হলে তাকে 'কাফির' ও ইসলামের শত্রু প্রমাণ করা খুবই জরুরী। নইলে মুসলিম মানস সহজে এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সমর্থন মেনে নেবে না। এজন্য আমরা দেখেছি যে, প্রাচীন জঙ্গিবাদী গোষ্ঠিরা তাদের প্রতিপক্ষ মুসলমানদেরকে ঢালাওভাবে কাফির বলে ঘোষণা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা গুপ্ত হত্যা অভিযান পরিচালনা করত। বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামী কর্মে লিপ্ত মানুষদের মধ্যে বিদ্যমান এই জাতীয় কিছু ধারণা জঙ্গিদের জন্য প্রতিপক্ষদেরকে ঢালাওভাবে 'কাফির' বা ধর্মত্যাগী বলার সুযোগ করে দিচ্ছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, খারিজীগণ সর্বপ্রথম পাপের কারণে মুসলমানকে 'কাফির' বলতে শুরু করে। কোনো কোনো বিভ্রান্ত মুসলিম গোষ্ঠি বা দল এরূপ মত পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অগণিত হাদীসের আলোকে সাহাবীগণের যুগ থেকে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা মূলধারার মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিতে ইসলামের মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করছেন, তাকে কোনো পাপের কারণে 'অমুসলিম', কাফির বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা যাবে না, যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাস পোষণ করার ঘোষণা দিবেন। ইসলামী আইন লঙ্ঘনকারী, বা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী মুসলিম পাপী মুসলিম বলে গণ্য হবেন। কখনোই তাকে পাপের কারণে 'অমুসলিম' বা ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করা হবে না। তবে যদি তার এই পাপ বা অবাধ্যতাকে তিনি বৈধ মনে করেন বা ইসলামী বিধানকে বাজে, ফালতু, অচল বা অপালনযোগ্য বলে মনে করেন তবে তা কুফরী বা ধর্মত্যাগ বলে গণ্য হবে।[২]

গত অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন মুসলিম দেশে, বিশেষত মিসর, সুদান ও মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশে কিছু আবেগপ্রবণ 'অর্ধ-আলিম' ধর্মগুরু -প্রাচীন খারিজীদের মতই- পাপে লিপ্ত হওয়া বা ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করাকে 'কুফরী' বা ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মত্যাগ বলে মত প্রকাশ করতে থাকেন। বিশেষত তারা দাবি করতে থাকেন যে, আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জালিম শাসকগণ যেহেতু 'ইসলামী' আইনে বিচার করেন না, বা ইসলাম বিরোধী আইনে বিচার করেন, সেহেতু তারা সকলেই কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ। এরপর তারা বলতে থাকেন যে, এ সকল রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারকারী সকল নাগরিকই কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ। এদের মধ্যে একটি সুপরিচিত দল মিসরের শুকরী আহমদ মুসতফা প্রতিষ্ঠিত 'জামা'আতুল মুসলিমীন'। এরা এক পর্যায়ে তাদের দলভুক্ত হতে আপত্তি করে এমন সকল মানুষকে কাফির-মুরতাদ হিসেবে গণ্য করে এবং এইরূপ কাফির-মুরতাদদেরকে গুপ্ত হত্যা করার জন্য দলের কর্মীদের প্রতি নির্দেশ জারি করে। বিশেষত যে সকল আলিম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এদের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের বিভ্রান্তি বুঝাতে চেষ্টা করতেন বা তাদের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে কথা বলতেন তাদেরকে তারা গুপ্ত হত্যা করতে শুরু করে। যদিও মিসর সরকার এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তবুও অনেক আবেগী মুসলিমের মধ্যেই তাদের এ সকল মতামতের প্রভাব থেকে যায়। এছাড়া আরো অনেক গোষ্ঠি ও দলের মধ্যে এইরূপ চিন্তা বিভিন্নভাবে দেখতে পাওয়া যায়।[৩]

এরা খারিজীদের মত কুরআনের কিছু আয়াতের প্রমাণ পেশ করত। এছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, আইন, বিচার ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম বা ধর্মীয় নেতার বক্তব্য তারা নিজেদের পক্ষে পেশ করত।

বর্তমানে জঙ্গিদের মতবাদের অন্যতম ভিত্তি এই 'কাফির' বলার প্রক্রিয়া। একই পদ্ধতিতে তারা ঢালাওভাবে মুসলিম সমাজের মানুষদেরকে কাফির বলে ঘোষণা দিয়ে নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের পটভূমি তৈরি করছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, নেতা বা আলিমের কিছু আবেগী কথাকে তারা নিজেদের পক্ষে পেশ করছে। আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, অনেক আলিম বা ইসলামী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক বিষয়াদিতে সহজেই বিভিন্ন কর্ম বা মতকে 'কুফরী' বলে অভিহিত করেন। তাঁরা কুফরীতে লিপ্ত মানুষদেরকে হত্যার ফাতওয়া কখনোই প্রদান করেন না। কিন্তু জাঙ্গিদের হত্যাকাণ্ডের জন্য তাদের বক্তব্য কার্যকর পটভূমি তৈরি করে।

(৮) ফলাফল লাভের ব্যস্ততা

দ্রুত ফলাফল লাভের আগ্রহ জঙ্গিবাদের উত্থানের আরেকটি কারণ। "'ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে বা ইসলামের বিজয় আনতে হবে। অমুক বা তমুক পদ্ধতিতে তা আসবে না, বরং আমাদের এই পদ্ধতিতেই এ বিজয় দ্রুত হাতের মুঠোয় এসে যাবে।" "অমুক পদ্ধতিতে শত বৎসর বা হাজার বৎসর কাজ করলেও ইসলামের বিজয় আসবে না, কিন্তু আমাদের পদ্ধতিতে কাজ করলে অল্প সময়েই তা এসে যাবে।" এইরূপ প্রচারণা জঙ্গিদের কর্মী সংগ্রহের একটি বড় মাধ্যম।

---

[১] সহীহ মুসলিম ৩/১৪৮২

[২] বিস্তারিত দেখুন, ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিকহুল আকবার (মোল্লা আলী কারীর ব্যাখ্যাসহ) পৃষ্ঠা ১১৭; ইমাম তাহাবী, আল-আকীদা আত-তাহাবীয়াহ (ব্যাখ্যা সহ), পৃ. ৩১৬; ইবনু আবিল ইজ্জ, শারহুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৩১৬-৩১৫।

[৩] মুহাম্মাদ সুরূর বিন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহু ও আহলুল গুলু, পৃ. ৯-১১

www.assunnahtrust.com

জঙ্গিদের এই প্রচারণার জন্য একটি ভাল ক্ষেত্র ইতোমধ্যেই মুসলিম সমাজগুলিতে তৈরি হয়ে রয়েছে। সমাজে ইসলামী দাওআত, প্রচার, দ্বীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠি কর্মরত রয়েছেন। ইসলামী শিক্ষাকে অনুধাবন করা, গুরুত্ব নির্ণয় করা এবং প্রচারের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ সকল দলের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে এবং থাকাই স্বাভাবিক। তবে সবারই লক্ষ্য নিজ নিজ 'বুঝ' অনুসারে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতি মানুষদের আহ্বান করা। কে কত পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামকে উপস্থাপন করতে পারছেন সেটিই এখানে মূল বিবেচ্য হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু অনেক সময় আবেগী ইসলাম প্রচারক এক্ষেত্রে 'কত তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যাবে' তা বিচার করতে শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন, 'অমুক পদ্ধতি ভাল নয়, কারণ ঐ পদ্ধতিতে কর্ম করে শত বৎসরে বা হাজার বৎসরেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।' মনে হয় কে কত তাড়াতাড়ি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারল এর উপরেই আল্লাহ নবী-রাসূল ও মুসলমানদের হিসাব নিবেন।

ফলাফল লাভের জন্য ব্যস্ততা বা ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মের সফলতা বিচার ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যতম বিভ্রান্তি। এই ব্যস্ত তার ফলে দুই প্রকারের বিভ্রান্তির জন্ম নেয়।

প্রথম বিভ্রান্তি: ফলাফলের দ্রুতার ভিত্তিতে কর্মের বিচার অথবা ফলাফল না পাওয়ার কারণে কর্মকে ব্যর্থ মনে করা।

অনেক সময় আবেগী মুমিনের মনে ফলাফল লাভের উন্মাদনা তাকে বিপথগামী করে ফেলে। মুমিন চায় যে, সমাজ থেকে ইসলাম বিরোধী ও মানবতা বিরোধী সকল অন্যায় ও পাপ দূরীভুত হোক। কোনো মুমিনের মনে হতে পারে যে, এত ওয়ায, বক্তৃতা, বইপত্র, আদেশ নিষেধ ইত্যাদিতে কিছুই হলো না, কাজেই তাড়াতাড়ি কিভাবে সব অন্যায় দূর করা যায় তার চিন্তা করতে হবে। এই চিন্তা ভয়ঙ্কর ও ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন,

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপরে শুধু তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।"[১]

তাহলে মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজের সৎ থাকা ও অন্যদেরকে সৎপথে আহ্বান করা। আমাদের আহ্বান বা আদেশ-নিষেধ সত্ত্বেও যদি কেউ বা সকলেই বিপথগামী হয় তবে সেজন্য মুমিনের কোনো পাপ হবে না বা কোনো মুমিনকে সেজন্য আল্লাহর দরবারে দায়ী হতে হবে না। অনেক নবী শতশত বছর দাওয়াত ও আদেশ-নিষেধ করেছেন, কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ সুপথপ্রাপ্ত হয় নি। এতে তাঁদের মর্যাদার কোনো কমতি হবে না বা তাঁদের দায়িত্ব পালনে কোনো কমতি হয়নি। কাজেই মুমিন কখনোই ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হবেন না। বরং নিজের দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসের আলোকে পালিত হচ্ছে কিনা সেটাই বিবেচনা করবেন।

দ্বিতীয় বিভ্রান্তি: দ্রুত ফলাফল লাভের জন্য ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতির বাইরে অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার দুইটি পর্যায় রয়েছে: (১) নিজের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং (২) অন্যের জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্ম দুইভাবে আঞ্জাম দেওয়া হয়: (১) অরাষ্ট্রীয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, দলগত বা গোষ্ঠিগতভাবে এবং (২) রাষ্ট্রীয়ভাবে। অরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার একটিমাত্রই মাধ্যম, তা হলো 'দাওয়াত' বা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দাওয়াতের পাশাপাশি আরো দুটি মাধ্যম রয়েছে: (ক) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও (খ) প্রয়োজনে শত্রুরাষ্ট্রের কবল থেকে প্রতিষ্ঠিত দ্বীন, রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জিহাদ বা কিতাল অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ করা।

সকল পর্যায়ে ও ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হলো সহিংসতা ও সীমালঙ্ঘন বর্জন করা। শুধু সহিংসতা বর্জনই নয়, দাওয়াত, প্রচার, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি 'দ্বীন প্রতিষ্ঠার' সকল কর্মে 'অহিংসতা' দ্বারা 'সহিংসতা'-র প্রতিরোধ করতে এবং সহিংসতার প্রতিবাদে 'উত্তম' আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে,

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। (মন্দ) প্রতিহত কর উৎকৃষ্টতর (আচরণ) দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা সৌভাগ্যবান।"[২]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

"মন্দের মুকাবিলা করুন যা উৎকৃষ্টতর তা দিয়ে, তারা যা বলে আমি সে সম্পর্কে বিশেষ অবহিত।"[৩]

যুদ্ধ যদিও একটি সহিংস কর্ম, তবুও ইসলাম তাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অহিংস ও যথাসম্ভব কম 'সহিংস' করতে নির্দেশ দিয়েছে বলে আমরা দেখেছি।

---

[১] সূরা ৬: মায়িদা, আয়াত ১০৫।

[২] সূরা হা মীম সাজদা (ফুস্‌সিলাত): ৩৩-৩৫ আয়াত।

[৩] সূরা মুমিনূন, ৯৬ আয়াত।

www.assunnahtrust.com

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী দা'ওয়াত বা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা অনেক সময় ব্যক্তি, গোষ্ঠি, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতিরোধ, অত্যাচার বা সহিংস আচরণের সম্মুখীন হন। এতে দা'ওয়াতে লিপ্ত মুসলিমের মধ্যে প্রতিক্রিয়ামূলক 'সহিংসতা'র আবেগ তৈরি হয়। এর সাথে 'দ্রুত ফললাভে' চিন্তা 'দাওয়াত' বা 'দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মে রত ব্যক্তিকে ইসলাম নির্দেশিত এই 'অহিংস' পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আবেগ নির্দেশিত 'সহিংস' পথে যাওয়ার প্ররোচনা দেয়। তিনি ভাবতে থাকেন 'সহিংসতা' বা কল্পিত 'জিহাদ'ই দ্রুত ফললাভের বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ, যদিও প্রকৃত সত্য এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ইতিহাসে ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠির সহিংসতা, তথাকথিত 'জিহাদ' ও 'শাহাদতের' অনেক ঘটনা আছে। তারা সকলেই 'দ্রুত ফললাভের' আবেগ নিয়ে প্রকৃত বা কল্পিত 'জিহাদে' ঝাপিয়ে পড়ে 'শহীদ' হয়েছেন, কিন্তু কেউই দ্রুত বিজয় তো দূরের কথা কোনো বিজয়ই অর্জন করতে পারেন নি। বস্তুত ইসলামের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, 'অহিংস' ও 'মন্দের মুকাবিলায় উৎকৃষ্টতর' আচরণই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিজয়ের একমাত্র পথ। এই পদ্ধতিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবের কঠোর হৃদয় যাযাবরদের হৃদয় জয় করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও সকল যুদ্ধে সর্বোচ্চ অহিংসতা অবলম্বন করেন।

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদের বিস্তারে উপরের ৭টি কারণের প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যা একটি প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো, এ সকল কারণের দিকে বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যে কোনো সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হলো সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা। উপর্যুক্ত কারণগুলি প্রকৃতই জঙ্গিবাদের প্রসারের পিছনে কার্যকর কি না, এগুলি ছাড়া অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না তা বিবেচনা করতে হবে।

যে কোনো বৃহৎ সমাজে দু-চারটি বিভ্রান্ত বা বিপথগামী গোষ্ঠি বা ব্যক্তি থাকতে পারে। কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ থেকেই এদেরকে একেবারে নির্মুল করা যায় না। তবে এইরূপ বিপথগামীরা যেন কোনোভাবেই সমাজের মধ্যে তাদের বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে এবং সমাজের জন্য দুষ্টক্ষতে পরিণত না হয় সে জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

বাংলাদেশের মত সুশৃঙ্খল সমাজে জঙ্গিবাদের উত্থান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। পাকিস্তান বা অন্য অনেক দেশে শিয়া-সুন্নি, ওহাবী-রেজবী ইত্যাদি ধর্মীয় দল-উপদলের মধ্যে সহিংসতা অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক 'ভায়োলেন্স' বা সহিংসতা কখনোই ছিল না। আমাদের দেশে এরূপ সহিংসতার মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারা কোনো ক্রমেই ছোট করে দেখার মত বিষয় নয়। মহান আল্লাহ আমাদের দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্তি, সহিংসতা ও হানাহানি থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

www.assunnahtrust.com